জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১

রবীন্দ্রনাথের গানে ছন্দের ব্যবহার

সুবীর চন্দ্র ঘোষ*

Abstract

The very basic element of music is rhythm.This rhythm originates from mother nature.Rhythm has been recognized as an individual branch of study in the history of Indian classical music or literature. This branch will be misjudged if compared only to literature or music. We can perceive rhythm in world literature and music. We experience an amazing variety of rhythm in the Indian classical music in general and in the subcontinental music and literature in particular. It can be said that this entire universe is shrouded in music and rhythm. One major aspect of music is songs which must be tied to rhythm. Again, songs tied to a particular rhythm might have different variations. In defence to this proposition, we will take a few Tagore's songs into consideration. Before that I would like discuss some essential issues regarding the application of rhythm in music.

সংগীতের মূল উপাদানই হলো 'ছন্দ'। সেই ছন্দের উদ্ভব প্রকৃতি (ঘধঃঁৎব) থেকে। ভারতীয় সংগীতে বা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই 'ছন্দ' একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা বা জ্ঞানের বিষয় বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। কেবল ভারতীয় সংগীত বা সাহিত্য বললে বিষয়টাকে লঘু বলে মনে হবে। সমগ্র বিশ্বসাহিত্য এবং বিশ্বসংগীতের মধ্যেই ছন্দের প্রভাব আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তবে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত তথা এই উপমহাদেশীয় সাহিত্য-সংগীতে ছন্দের এক অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ করে থাকি। বলতে পারি আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংগীতের সুর ও ছন্দের আবরণে আবৃত। সংগীতের একটা বিশেষ দিক হচ্ছে গান, যাকে অনিবার্যভাবেই ছন্দোবদ্ধ হতে হয়; এমনকি ঢালা গানেও অন্তর্নিহিত থাকে 'মুক্ত ছন্দ'। আবার একই তালভুক্ত গানেও ছন্দের বিভিন্ন রূপ থাকতে পারে। এই অভিমতের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের বেশকিছু গান বিবেচনা করে রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দের নানামুখী ব্যবহার, ছন্দোবৈচিত্র্য চিহ্নিত করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দোবৈচিত্র্য সমৃদ্ধ গানগুলোর মধ্যে কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দের বিশেষায়িত ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে আলোচনার শুরুতে শিল্পকরণ হিসেবে ছন্দ এবং সংগীতে ছন্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় আলোকপাত করছি।

সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্র যার যার নিজের অবস্থান থেকে সেই সুর ও ছন্দে বয়ে চলেছে অদ্যাবধি। সেই সুর এবং ছন্দের ব্যত্যয় ঘটলে পৃথিবী তার নিজস্ব অস্তিত্ব হারাবে তা বলতেই পারি। ছন্দের প্রকৃতি স্বাভাবিক। পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যেই ছন্দের অস্তিত্ব থাকে। মানুষ যখন কথা বলে তখন তার মধ্যেও ছন্দ প্রবহমান হয়। আমরা যখন কথা বলি তখন কখনোই ছন্দের প্রয়োগ নিয়ে বা ভাবনা চিন্তা নিয়ে কথা বলি না। শারীরিক এবং মানসিক কারণেই আমাদের মুখের বর্ণ, শব্দ এবং বাক্যসহযোগে ছন্দায়িত হয়ে প্রকাশিত হয়।

*এম. ফিল. গবেষক, সংগীত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

'সংগীত এবং ছন্দ' উভয়ই একটি ধ্বনিশিল্প। সে শিল্প ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণরীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত 'শিল্পিত বাক্যরীতির'ই নাম ছন্দ। কিন্তু এই উচ্চারণ তত্ত্বই সবটুকু নয়। তার আরও একটা দিক আছে; সেটা শিল্পের দিক। আবার সেই শিল্পের দিকও সর্বতোভাবে বাক্‌নির্ভর নয়। সে যেমন মানুষের কণ্ঠকে আশ্রয় করতে পারে তেমনি পারে 'বীণার তন্ত্রী'কেও। কণ্ঠ সংগীত মানুষের বাক্‌রীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে না। তাকে পুরোপুরি আমলও দেয় না। সে বাক্‌রীতিকে আশ্রয় করে না। বাক্‌রীতিকেই তার অনুসারী করে তোলে। এই হিসেবে ছন্দ এবং সংগীতের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য আংশিক মাত্র, সার্বজনীন নয়। প্রধান পার্থক্য সুরের। ছন্দ সর্বতোভাবেই সুর নিরপেক্ষ। পক্ষান্তরে সুরই হচ্ছে সংগীতের প্রাণ। অতএব গীতি-তত্ত্বের নীতি দিয়ে ছন্দ-তত্ত্বের পুরো পরিচয় পাওয়া যে সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য।

মানবজাতি ছন্দকে প্রথম উপলব্ধি করে তার নিজের শরীরের ভিতর থেকে। মানবশিশু জন্মের পরপর তার অঙ্গ সঞ্চালন শুরু করে এবং আস্তে আস্তে সে তার শরীরের নিয়ন্ত্রণ নিতে দু-পায়ের ওপর ভর করে। এভাবে ধীরে ধীরে তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার যেমন: হাত-পা ছুঁড়ে, হাতের ইশারায় ও শরীর দুলিয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করে। এটাকে অনিয়ন্ত্রিত ছন্দ বলা যায়। সে যখন বুঝতে শিখে তখন আনন্দের বহিঃপ্রকাশ দুই হাতের তালুর সাহায্যে শব্দ করতে থাকে। এই শব্দ করতে করতে শরীরের ভিতর এক ধরনের আন্দোলন বা দোল তৈরি হয়। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের এই যে গতি, সে গতিই ছন্দের উদ্ভব।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- 'মানুষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয়, তার ভাবের আন্দোলনকেও যেমন সাড়া দেয়, এমন আর কোন জীবে দেখিনে। অন্য জন্তুর দেহেও ভাষা আছে, কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গির মত সে ভাষা চিন্ময়তা লাভ করেনি।'[১]

ছন্দ প্রকৃতিরই একটি অংশ বা উপাদান যা কোনো নির্দিষ্ট গতি, লয়, মাত্রা, বিভাগ, পদ্ধতি, রীতি-নীতি, নিয়ম প্রভৃতি এমন কয়েকটি উপ-উপাদান দিয়ে তৈরি, যা আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু বুদ্ধি এবং অনুভব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি। ছন্দের একটা সামগ্রিক রূপ আছে, যা আমাদের উপর নিত্য ক্রিয়াশীল। এই ছন্দ প্রকৃতির দান বা অংশ হলেও প্রকৃতিরই সৃষ্টি মানুষ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণের মধ্যে ক্রিয়াশীল।

সংগীতে মধ্যযুগ থেকে যে ছন্দ প্রকরণ সৃষ্টি হয়, তা হলো নির্দিষ্ট তালের আবর্তে বিভিন্ন মাত্রাসংখ্যক বোলের ব্যবহার। সাধারণত প্রতিটি বোলেরই একটি নিদিষ্ট মাত্রাসংখ্যা থাকে। যখন এই বোলের মাত্রা সংখ্যা সম-সংখ্যক মাত্রাবিশিষ্ট তালে সমানভাবে ব্যবহার হয়, তখন তা হয় 'সমলয়'। আবার তালের এই মাত্রার মধ্যে বোলকে দুইবার প্রকাশ করলে বলা হয় 'দু-গুণ' বা দুই গুণ। তিনবার প্রকাশ করলে তা 'তিনগুণ বা ত্রিগুণ', চারবার প্রকাশে 'চারগুণ বা চৌগুণ'। এই নামকরণের লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দুন, তেদুন এবং দৌদুন এই নামগুলি সাংগীতিক পরিভাষা। আবার দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ ইত্যাদি নামগুলো গাণিতিক পরিভাষা। এর থেকে বোঝা যায় যে, গাণিতিক বুদ্ধি প্রকরণ, ছন্দ প্রকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী ছিল। লয়ের মধ্যে এমন ছন্দ প্রকরণকে লয়কারী বলে। উপরিউক্ত লয়কারীর মধ্যে সরলবৃত্ত থাকার কারণে এগুলোকে 'সরল লয়কারী' বলে। এমন ছন্দ প্রকরণ বা লয়কারীর ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের প্রয়োগ দেখা যায়। লয়ের মধ্যে এমন ছন্দ প্রকরণকে লয়কারী বলে। যেমন নিদিষ্ট মাত্রা সমন্বিত তালে যদি এক আবর্তের মধ্যেই দেড়গুণ মাত্রা সংবলিত বোলকে সমানভাবে প্রকাশ করা হয়, তবে যে ছন্দ হয় তার নাম 'দেড়গুণ'

বা 'আড়ি'। অনুরূপ তালের মাত্রা সংখ্যার সোয়াগুণ মাত্রা সংবলিত বোলকে এক আবর্তে প্রকাশ করলে 'সোয়াগুণ' বা 'কু-আড়' লয় বলে। তা ছাড়া বোলের মাত্রাসংখ্যা যদি পৌনে দু-গুণ হয় তবে তাকে 'বি-আড়ি' ছন্দ বলা হয়। এগুলো হলো ভগ্নাংশভিত্তিক ছন্দ এবং প্রচলিত লয়কারী। এই লয়কারী বিভিন্ন মাত্রার বোলকে বিভিন্ন মাত্রার তালে প্রকাশ করে 'মিশ্রছন্দ' সৃষ্টি করা হয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বেশির ভাগ ছন্দেও একটি করে সাংগীতিক নাম বা গাণিতিক নাম থাকে। এই গাণিতিক নামগুলোর প্রেক্ষাপটে ছন্দের সংজ্ঞা নির্ণয় করলে বলতে হয় যে, ছন্দ হলো একটি বিশেষ অনুপাত। যার সৃষ্টি হয় বোলের মাত্রাসংখ্যা দিয়ে তালের মাত্রাসংখ্যা ভাগ করে। সংগীতের যে ছন্দ তা 'সম ও বিষম' ভেদে দু-প্রকার। এদের মধ্যে বিষম ছন্দের মাধুর্যই বেশি ও আকর্ষণীয় হয়। রবীন্দ্রনাথ বিষম ছন্দ সম্পর্কে বলেছেন–

> 'বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে– তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তাহার নৃত্য।' এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হত, তাহা হইলে ছন্দই হত না। এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উসকিয়ে দেয় এবং বিচিত্রময় করে তোলে। এই জন্য অন্য ছন্দের চেয়ে বিষম মাত্রার ছন্দে গতিকে যেন আরো বেশী অনুভব করা যায়।[২]

সংগীত গুণীগণ গাণিতিক হিসাব নিকাশের মাধ্যমে সংগীতে ছন্দ কে যেভাবে বিশ্লেষণ বা ব্যবহার করেছেন তা সেই সকল সংগীত গুণীদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত বলা যায়। কতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে গাণিতিক নিয়মকে ছন্দে নিবদ্ধ করেছেন। সংগীতক্রিয়াতে এমন কিছু বিষয় লক্ষ করা যায় যেমন তালের বিভাগ পরিবর্তন,তালের আঘাত পরিবর্তন, মাত্রার পরিবর্তন এবং তালের গতির পরিবর্তনেই সেসব গাণিতিক হিসাব-নিকাশের সুনিপুণ ব্যবহারে সংগীতের ছন্দোবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে মাত্রার বিরাম যেমন থাকে তেমনি স্বর, বোল বা বাণীর উচ্চারণ কখনও প্রবল কখনও বা হালকা ভাবে প্রয়োগের মাধ্যমেও সংগীতে ছন্দের বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। সাধারণত গতি পরিবর্তনের মাধ্যমে ছন্দ পরিবর্তন হয়। এই যে গতি পরিবর্তন তার কিছু গাণিতিক নিয়ম আছে। যেমন :

(১) বরাবর লয় বা সমলয়
(২) সোয়াগুণ লয়
(৩) দেড়গুণ বা দেড়ীলয়
(৪) পৌনে দুইগুণ লয়
(৫) দ্বিগুণ লয়।

উপরিউক্ত গতিগুলো আরও বিশ্লেষণাত্মক ভাবেও ব্যবহার করা যায়। গাণিতিকভাবে সংগীতে ছন্দের এমন রূপান্তর মনকে প্রফুল্ল করে, মনে প্রীতি আনে।

সংগীতে তালের তালাঘাত পরিবর্তন করেও ছন্দের বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। যেমন দুই-তিন (২। ৩) ছন্দে যদি তালি দেওয়ার রীতি থাকে, সেখানে সেই ছন্দটিকে উলটে তালি দেওয়া। যেমন তিন-দুই (৩। ২) এইরকম। আবার তিন-চার (৩। ৪) মাত্রার ছন্দের তালিকে পরিবর্তন করে চার-তিন (৪। ৩) মাত্রার ছন্দে তালি দেওয়া। কোনো একটি তাল দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। যেমন ষষ্ঠী তাল–৬ মাত্রা–এর প্রকৃত ছন্দ দুই-চার (২। ৪) মাত্রার ছন্দ। এই তালকেচার-দুই (৪।

২)মাত্রার ছন্দে আঘাত পরিবর্তনে ছন্দ বৈচিত্র্য করা হয়। এই যে ছন্দের পরিবর্তন, এতে তালাঘাতেরও পরিবর্তন হয়।

সংগীতে 'দমদার ও বেদমদার ছন্দ' আছে। দমদার ছন্দ হলো– কোনো মাত্রার বা স্বরের অক্ষর উচ্চারণে বিরত থাকা। যাকে বলা হয় 'ক্ষম', এবং দীর্ঘ মাত্রার বিরতি হলো 'দম'। দম বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় 'উচ্চারণের পূর্ববর্তী' মাত্রার বিরতিকে যা 'দমদার' ছন্দ বলেই পরিচিত। অক্ষর সন্নিবেশের মধ্যে কোনো কোনো অক্ষর যদি প্রবল ভঙ্গির উচ্চারণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাতেও এক প্রকার ছন্দের উদ্ভব হয়। একে বলে 'প্রস্বন যুক্ত' ছন্দ (প্রস্বন অর্থ জোর বা ঝোঁক)।

ত্রিতালের ওপর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:

+				২				০				৩				+
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা	ধা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১
↑				↑				↑				↑				↑
প্রস্বন				বিভাগ বা যতি				বিভাগ বা যতি				বিভাগ বা যতি				অপস্বন

(প্রবল ঝোঁক বা সম্)

অতএব এটি বিশুদ্ধ তালের পর্যায়ে পড়ে কারণ এতে ছন্দের উপাদানগত পারম্পর্য রয়েছে। গতি পরিবর্তনে ছন্দের যে বিকাশ তা ছন্দোবৈচিত্র্যেরই একটা দিক। গাণিতিকভাবে বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

এখানে প্রত্যেকটি গতিকে চার মাত্রায় দেখানো হলো–প্রতিটি ছন্দ বোল, স্বর, তারযন্ত্রের আঘাত বা স্ট্রোক (stroke) এবং সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

সমগুণ:

১	২	৩	৪	×
ধা	ধি	ধি	না	ধা
সা	রে	গা	মা	
ডা	রা	ডা	রা	

সোওয়াগুণ:

১	২	৩	৪	×
ধি sss না	sss ধি s	ss ধি ss	s না sss	ধি
সা sss রে	sss গা s	ss মা ss	s পা sss	
ডা sss রা	sss ডা s	ss রা ss	s ডা sss	

দেড়গুণ:

১	২	৩	৪	×
ধা s ধি	s না s	না s তি	s না s	ধা
সা s রে	s গা s	মা s পা	s ধা s	
ডা s রা	s ডা s	ডা s রা	s ডা s	

পৌনে দুইগুণ:

১	২	৩	৪	×
ধি sss ধি ss	sনা sss ধি s	ss না sss ধি	sss না sss	ধি
সা sss রে ss	sগা sss মা s	ss পা sss ধা	sss নি sss	
ডা sss রা ss	sডা sss রা s	ss ডা sss রা	sss ডা sss	

দুই গুণ:

১	২	৩	৪	×
ধা ধি	ধি না	ধা ধি	ধি না	ধা
সা রে	গা মা	পা ধা	নি র্সা	
ডা রা	ডা রা	ডা রা	ডা রা	

আড়াই গুণ:

১	২	৩	৪	×
ধি s না s ধি	sধি s না s	ধি s না s ধি	sধি s না s	ধি
সা s রে s গা	sমা s পা s	মা s পা s ধা	sনি s র্সা s	
ডা s রা s ডা	sরা s ডা s	রা s ডা s রা	sডা s রা s	

তিন গুণ:

১	২	৩	৪	×
ধা ধি না	না তি না	ধা ধি না	না তি না	ধা
সা রে গা	মা পা ধা	গা মা পা	ধা নি র্সা	
ডা রা ডা	ডা রা ডা	ডা রা ডা	ডা রা ডা	

সাড়ে তিনগুণ:

১	২	৩	৪	×
ধি s ধি s না s ধি	s না s ধি s না s	ধি s ধি s না s ধি	s না s ধি s না s	ধি
সা s রে s গা s মা	s পা s ধা s নি s	র্সা s নি s ধা s পা	s মা s গা s রে s	
ডা s রা s ডা s রা	s ডা s রা s ডা s	রা s ডা s রা s ডা	s রা s ডা s রা s	

চার গুণ:

১	২	৩	৪	×
ধি ধি ধি না	না ধি ধি না	না তি তি না	না ধি ধি না	ধি
সা রে গা মা	পা ধা নি র্সা	র্সা নি ধা পা	মা গা রে সা	
ডা রা ডা রা	ডা রা ডা রা	ডা রা ডা রা	ডা রা ডা রা	

পাঁচ গুণ:

১	২	৩	৪	×
ধি না ধি ধি না	ধি না ধি ধি না	ধি না ধি ধি না	ধি না ধি ধি না	ধি
সা রে গা মা পা	রে গা মা পা ধা	গা মা পা ধা নি	মা পা ধা নি র্সা	
ডা রা ডা রা ডা	ডা রা ডা রা ডা	ডা রা ডা রা ডা	ডা রা ডা রা ডা	

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে নানাবিধ ছন্দোবৈচিত্র্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তিনি কিছু কিছু গানে ব্যবহৃত তালে ছন্দের অনেক বৈচিত্র্য এনেছেন। অনেকে এগুলোকে 'রবীন্দ্রসৃষ্ট' তাল বলে অভিহিত করেন। অবশ্য এতে অনেক মতানৈক্যও পরিলক্ষিত হয়। কর্ণাটকী সংগীতের অপ্রচলিত তাল হতে ৭ টি তালকে বিভিন্ন ছন্দানুযায়ী প্রবর্তন কবিগুরুর বিশেষ কৃতিত্ব বহন করে। উত্তরভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় প্রচলিত তাল– অর্থাৎ দাদরা, কাহারবা, রূপক, ত্রিতাল, তীব্রা, যৎ, একতাল, সুলতাল, ঝাঁপতাল, খেমটা, আড়-খেমটা, আড়া ঠেকা, মধ্যমান, কাওয়ালী, আড়া চৌতাল, পঞ্চম সওয়ারী, ধামার প্রভৃতি তালকে নিয়েও ছন্দ বিন্যাসের অন্ত নেই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র প্রবর্তিত তালে ছন্দের ব্যবহার নিয়ে বলা যায় রবীন্দ্র প্রবর্তিত তাল সাধারণত ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী তাল ও নবপঞ্চতালের উল্লেখ পাই। তাল ও লয়ের নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি চার মাত্রার তালকে দুই-দুই (২। ২) ছন্দে বিভক্ত করেছেন। কর্ণাটকী তাল 'রূপকম্'-এর ন্যায় অর্দ্ধঝাঁপকে মাত্রা সংখ্যানুসারে দুই-তিন (২।৩) মাত্রার ছন্দে এবং ঝম্পক তালের ৫ মাত্রাকে আবার তিন-দুই (৩। ২) মাত্রার ছন্দে বিন্যাস করেছেন। ৬ মাত্রাবিশিষ্ট তিন-তিন (৩। ৩) মাত্রার ছন্দের দাদ্‌রা ও কাশ্মিরী খেমটা তালকে একটানা ৬ মাত্রার ছন্দ সৃষ্টি করেছেন।

প্রকৃতি পর্যায়ের একটি গানের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে– 'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ'। গানটি তিন-দুই (৩।২) মাত্রার ছন্দে পাঁচ মাত্রার তালে রচিত।

<u>**বোল-**</u>

+			২		+
ধি	ধি	না |	ধি	না |	ধি
১	২	৩	৪	৫	১

II রা $^{\text{গ}}$মা রা । মা মা I পা পা পা । মা পা I

আ মা রে য দি জা গা লে আ জি

I $^{\text{প}}$র্সা -া -া । -ধা -ধপা I -মা -া -া । -া -$^{\text{ম}}$গা

না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০থ্ I [৩]

লক্ষণীয় বিষয় যে, এই গানটি ঝাঁপতালের (২ । ৩ । ২ । ৩) মাত্রার ছন্দেও গীত হতে পারত যেমন–

II রা $^{\text{গ}}$মা । রা মা মা । পা পা । পা মা পা I

আ মা রে য দি জা গা লে আ জি

I $^{\text{প}}$সা -া । -ধা -া -ধপা । -মা -া । -া -া -$^{\text{ম}}$গা I

না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ থ্

কিন্তু এই ছন্দের বাণীর সম্পূর্ণতা বজায় থাকে না এবং তালেরও নিজস্ব ছন্দ থাকে না । ফলে অর্থবিভ্রান্তি ঘটে। গানটি কবিতার মতো পড়লে- 'আ মা রে । য দি । জা গা লে। আ জি' পর্যন্ত (৩ । ২) মাত্রার একই ভাব পাই। কিন্তু 'নাথ' শব্দটি পড়তে গেলে দশ মাত্রা পর্যন্ত বিরাম নিতে হয় না। এখানে বাণী এবং সুরকে প্রাধান্য দিতেই 'র্সা' স্বরকে দশ মাত্রা পর্যন্ত টানা হয়েছে। এখানেই সুরের এবং ছন্দের সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনবোধে একই তালের বিভিন্ন রকম ছন্দ সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে ষষ্ঠী তালের 'চির বন্ধু চির নির্ভর গানটি দুই-চার (২। ৪) ছয় মাত্রার ছন্দে গীত এবং পরবর্তী সময়ে গানটি চার-চার (৪। ৪) আট মাত্রার ছন্দেও নিবদ্ধ করেছেন। তেমনি পূজা পর্যায়ের 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল' গানটি মাত্রা সংখ্যা বজায় রেখে চার-দুই (৪। ২) ছয় মাত্রার ছন্দে বেঁধেছেন।

দুই-চার (২। ৪) ছয় মাত্রার ছন্দের গানটির স্বরলিপি নিম্নরূপ–

তাল ষষ্ঠী- মাত্রা সংখ্যা-৬, ছন্দ- (২। ৪)

বোল-

+		২				+
ধা	গে ।	ধা	গে	তে	টে ।	ধা
১	২ ।	৩	৪	৫	৬	১

ˊ ২ ।। ˊ ২ ˊ ২

II পা পা । মধা -া -া ধা I ধপা ধা । পধা -ণা ধপা মা I গা মা । ধপা -া -া পা I

চি র ব০ ০ ন্ ধু চি র নি০ র্ ভ০ র চি র শা ০ ন্ তি

I মগা মা । পধা -ণর্সা ণধা পধা II

তু মি হে০ ০০ প্র০ ভু০

৪ । ৪ ছন্দের গানটির স্বরলিপি নিম্নরূপ–

এই ছন্দটিতে তালের কোন উল্লেখ নেই ফলে (৪ । ৪) মাত্রার ছন্দে বোল-বাণী বসিয়ে বাজানো হয়ে থাকে। এই গানটি মূলত দক্ষিণী-ভাঙা গান ও মহীশূরী ভজন গানের আদলে গাঁথা। তুলনামূলক মধ্যলয়ে ঠেকা বাজালে গানটির গতি ও ছন্দ বজায় থাকে।

বোল-

+				২				+
ধা	ধিন	ধাগে	তিন ।	ধা	তিন	তাকে	তিট।	ধা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১

IIপা পা I ধা -া -া ধা । ধপা ধা না -া। নধা পা পগা মা। পা -া -া পা I ৪

চি র বন্ ০ ০ ধু চি র নি ০ র্ভ র চি র শা ন্০ তি

‘হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে’

তাল ষষ্ঠী, মাত্রা সংখ্যা-৬, ছন্দ চার-দুই(৪ । ২)

বোল-

+				২		+
ধা	তেটে	ধিন	না।	ধাগে	তেটে।	ধা
হৃ	দ	০	য়	আ	মার্	
১	২	৩	৪	৫	৬	১

এই গানটির গতি তুলনামূলক ধীর হওয়ায় উপরিউক্ত বোল বাদনে গানের গতি বা ছন্দ ঠিক থাকে।

স্বরলিপি টি নিম্নরূপ–

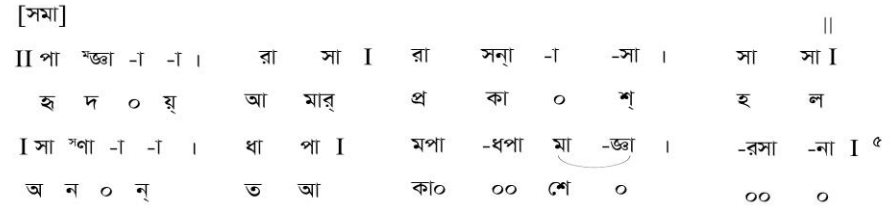

ছন্দ থেকে ছন্দের উত্তরণে কথা বা কবিতায় প্রয়োগের পর ছন্দের প্রয়োগ সংগীতে নানাভাবে হয়। যাকে আমরা সাংগীতিক ছন্দ বলি। সংগীতের একেক শাখায় একেক উপাদান। যেমন উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে রাগরূপ, তার চলন, ব্যাকরণ, রীতি-নীতি এবং তালই প্রধান। এখানে বন্দিশের কাব্যরূপের তেমন গুরুত্ব নেই বললেই চলে। যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রেও রাগরূপটি প্রধান। এবং প্রধান তার গৎ, তালের বাঁধন; কিন্তু অন্যান্য সংগীত যেমন: লোকসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত এসব গানে কাব্যের ভূমিকা ও তার অন্তর্নিহিত অর্থের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। অবশ্যই সেই সঙ্গে তালের ভূমিকাও সমান কাজ করে।

রবীন্দ্রনাথের গানে বাংলাদেশের লোকগান, ভাটিয়ালি, সারিগান ইত্যাদি গানের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে রাগ সংগীতের। সে-ক্ষেত্রে তবলা, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গের সাথে শ্রীখোলের ব্যবহারও রবীন্দ্রনাথের গানে সৌন্দর্যবর্ধন করেছে। বঙ্গদেশেই এই বাদ্যের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। শ্রীখোল মাটির তৈরি বলে এই বাদ্যটিকে মৃদঙ্গও বলা হয়ে থাকে। শ্রীখোল- মূলত কীর্তন গানেই বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়াও লোকগান এবং বাউলগানেও এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। তবে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব, চলন, প্রকৃতি, লয় অনুসারে এসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাই ধ্রুপদাঙ্গ গানে সাধারণত পাখোয়াজ বাজানো হয়। এবং বাউলাঙ্গ, কীর্তনাঙ্গ গানে শ্রীখোল ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের গানে একই তাল বিভিন্ন গানে বিভিন্ন ছন্দে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে বাদক এবং বাদনপ্রণালীর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। গানভেদে রবীন্দ্রসংগীতের বেলায় সঙ্গত পদ্ধতি বা বাদন পদ্ধতি স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। যেমন–বিলম্বিত খেয়ালে একতাল, তিলওয়াড়া, বা ঝুমরা তাল খুব সংযতভাবে 'ঠেকা' বাজানো হয়। মধ্য ও দ্রুত লয়ের খেয়ালে যেমন নানারকম ছন্দে ঠেকার প্রকার, রেলা-পড়ন, ছোট ছোট টুকড়া সঙ্গতে বৈচিত্র্য আনে। এ ক্ষেত্রে সঙ্গতকারী তার বৈচিত্র্যপূর্ণ শৈলী দিয়ে নিজস্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাব্যপ্রধান বাংলা গান বা রবীন্দ্রসংগীতের বেলায় সঙ্গতের প্রয়োগ অনেকটা সংযত। এখানে রেলা-পড়ন বোলের আধিক্য ঘটলে গানের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ব্যঘাত ঘটে। এ ক্ষেত্রে শাস্ত্রমতে তালের হিসাব এবং ঠেকা ঠিকই থাকবে, তা সত্ত্বেও গানের বাণী-সুর, চলাকে তাল-যন্ত্রের আওয়াজ ছাপিয়ে শ্রোতার কাছে শ্রুতিমধুর হতে হয়।

রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

> অনেকদিন থেকেই কবিতা লিখিতেছি, এই জন্য যতই বিনয় করি না কেন, এটুকু না বলিয়া পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখতে বসলাম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যে রকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের ওস্তাদী দেবতা

> তেমনি ফোঁশ করিয়া উঠিলেন। আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে নিয়ম আছে তা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তার সংযমে সংকীর্ণ করে না, তাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে থাকে। সেই কথা মনে রেখে বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সংকোচ বোধ করি নাই। কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করে গান বাঁধতে চাহিলেম। ----তাল জিনিসটা সঙ্গীতের হিসাব বিভাগ। এর দরকারটা খুবই বেশী সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হোতে থাকে। তবু আমাদের দেশে এই বাধাটিকে অত্যন্ত বড়ো করতে হয়েছে কেননা মাঝারির হাতে কর্তৃত্ব। তবু আমাদের আসরে সবচেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল নিয়ে। গান-বাজনার ঘোড় দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই নিয়ে বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করেই বেড়ে ওঠে। স্বয়ং সংগীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখো, সুর বলে আমাকে। কেননা দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করেছে–দুই মধ্যস্থের মধ্যে ঠেলাঠেলি। কর্তৃত্বের আসন কে পায়। মাঝ থেকে সঙ্গীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে। সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা, যেমন কেবল মাত্র ছন্দ কালে মিষ্ট শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়।[৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে একই তালকে বিভিন্ন রূপে ছন্দায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু গানে দেখা যায় তালের শেষ মাত্রায় গান শুরু এবং গানের শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে তালের ঝোঁক পড়ে এমন কিছু গান উল্লেখ করছি–।

প্রকৃতি পর্যায়ের ‘এ কী গভীর বাণী এল’ গানটি তিন-তিন(৩। ৩) মাত্রার ছন্দে বাঁধা। ‘এ কী’ এর ‘কী’ অক্ষরে ‘সম’ বা ঝোঁক পড়ছে-অর্থাৎ তালের শেষ মাত্রায় গানের শুরু।

তাল দাদরা: মাত্রা সংখ্যা-৬, তিন-তিন (৩ । ৩) মাত্রার ছন্দ।

\+ ০ +
ধা ধি না। ধা তি না। ধা
১ ২ ৩ ৪ ৫ এ কী
||
র্সা II ধনা -া -া। -া -া র্সা I র্সা -নর্গা [গ]র্রা । র্সা -া র্সনা I
এ কী০ ০ ০ ০ ০ এ কী ০০ গ ভী র্ বা০

I ধনা -া -া । -পা -া [প]ক্ষা I পা -া [প]ক্ষা । পা -া [প]ক্ষা I[৭]
ণী০ ০ ০ ০ ০ এ কী ০ গ ভী র্ বা

অনুরূপ আরেকটি প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের ‘তুমি তো সেই যাবেই চলে’ গানটিতেও ‘তুমি’র ‘মি’ অক্ষরে ঝোঁক পড়ে এবং গানটি তালের শেষ মাত্রায় শুরু। গানটি একতালে ত্রিমাত্রিক ছন্দে রচিত।

<u>বোল</u>–

\+   ২   ০   ৩   +

ধিন্ ধিন্ ধা । ধাগে তিন্ না । কৎ তে না । তেটে ধিন্ ধা । ধিন্

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

তু মি

[ক্ষা -া গঋা]

গা II গা -া ঋা । গা -া ঋা । গা -া ঋা । সা -া সপা I

তু মি ০ তো সে ই যা বে ই চ লে ০ কি০

I পা -া পক্ষা । পা -ক্ষনা ধা । পা -া ক্ষা । গা -পা ক্ষা I [৮]

ছু ০ তো০ মা ০০ র্ বে ০ বা কি ০ তু

প্রকৃতি পর্যায়ের ‘দক্ষিণ হাওয়া জাগো জাগো’ গানটি–চার-চার (৪ । ৪) মাত্রার ছন্দে কাহারবা তালে নিবদ্ধ। তালের শেষ মাত্রায় শুরু এবং ‘দক্ষিণ শব্দের ‘ক্ষি’ অক্ষরে ‘সোম’।

<u>বোল</u>-

\+   ০   +

ধা গি না তি । না গ ধি না । ধা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ দ খি

মা II পা -না [ন]ধা -সা । [র্স]না -া -া পক্ষা I ধপা -া [প]মা -া । গা -া -া গা I

দ খি ন্ হা ও য়া ০ ০ জা ০ গো০ ০ জা ০ গো ০ ০ জা

I গা -া গমা -রগা । গপা -া -া পা I পা -না [ন]ধা -র্সা । [র্স]না -া -া -া I [৯]

গা ও জা০ ০০ গা০ ০ ও জা গা ও আ ০ মা ০ ০ র্

স্বদেশ পর্যায়ের ‘তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে’ এই গানটিও তালের শেষ মাত্রায় শুরু। যদিও এ গানে দাদরা তালের উল্লেখ আছে কিন্তু গানের সুরের চলনের সাথে শ্রীখোলের বাদন সহযোগে বারো মাত্রার ঠেকার সঙ্গতে গানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। তাতে ছন্দের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায়।

<u>বোল</u>-

\+ ০ +

ধা ধিন্ না। ধা তিন্ না। ধা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১

৴ ০

ন্ধা II {পা সা -া । সা সা -রা I গা -া গপা । পা গা -া I

তোর্ আ প ন্ জ নে ০ ছা ড়ু বে তো রে ০

I -া -া গা । রা সা -না I ধ্া -সা সা । সা সা -রা I

০ ০ তা ব লে ০ ভা ব্ না ক রা ০

I সরা -গা রা । সা -া -া I -া -া -া । (-া -া ন্ধা)} I -া পা পা I

চ০ ল্ বে না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তোর্ ০ ও তোর্ [১০]

রবীন্দ্রনাথ একই গানে একাধিক তাল ও ছন্দ ব্যবহার করে গানগুলিতে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দের মিলন ঘটিয়েছেন। এমন কিছু গান উল্লেখ করা হলো, যে সব গানগুলো একই ছন্দে ভিন্নভিন্ন বৈচিত্র্য এসেছে যা লক্ষণীয়।

স্বদেশ পর্যায়ের 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে' গানটিতে বিভিন্ন তালের ছন্দোবৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

এখানে চার-চার-চার (৪ । ৪ । ৪) মাত্রার ছন্দে ৩ টি বিভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোনো তালের নামের উল্লেখ নেই। কিন্তু আমরা গানটিতে যখন তবলা বাজাই বা সঙ্গত করি সেখানে সাধারণত চৌতাল এর ঠেকার মতো বাজানো হয়ে থাকে। এই গানের রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীতের কিংবদন্তী শিল্পীদের সম্মেলক কণ্ঠে গীত এই গানটির প্রথম স্তবকে চৌতালের ব্যবহার স্বরলিপি অনুযায়ী না হলেও বর্তমানে প্রচলিত। স্বরলিপিতে চতুর্মাত্রিক একতাল খেয়ালধর্মী হওয়া সত্ত্বেও গানের বাণী বন্ধন এবং গঠন কৌশলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে চৌতালের ব্যবহার অযৌক্তিক মনে হয় না বরং তাতে গানের রস (উদ্দীপনা রস) আরও সংগঠিত হয় বলে মনে হয়। স্বরলিপি অনুযায়ী চৌতালের ঠেকা-যার গঠনশৈলী স্বরলিপিতে দেখানো ছন্দ বিভাগের অনুরূপ।

চতুর্মাত্রিক একতাল - (৪/৪/৪) মাত্রার ছন্দ।

<u>বোল</u>-

\+ ২ ৩ +

ধিন্ ধিন্ নানা তেটে। ধি না তাগি তেরেকেটে। ধাগি তেরেকেটে ধিধি নানা। ধিন্

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১

আবার দেখা যাচ্ছে একই গানের দ্বিতীয় পদটিতে– 'কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া' থেকে তিন-দুই-দুই (৩। ২। ২) মাত্রার ছন্দে নিবদ্ধ। অর্থাৎ তেওরা তালের মতো বাজানো হয়, <u>বোল</u>-

স্বরলিপি অনুয়ায়ী চৌতালের ঠেকা:

+											+	
ধা	ধা	দেন্	তা।	কিট	ধা	দেন্	তা।	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে।	ধা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	

								।।						
II	গা	মা	ধপা	-া	।	গা	মা	"ধা	-া	।	ধনঃধঃ	-ননা	র্সাঃ	-নঃ I
	আ	নন্	দ ধ্ব	০		নি	জা	গা	ও		গ০০	০গ	নে	০

+		২		৩		+	
ধা	দেন্	তা।	তেটে	কতা।	গদি	ঘেনে।	ধা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১

I	ধা	না	-া	|	র্সা	-া	|	ধা	-না	I	পা	-ধা	-া	|	মা	-া	|	-পা	মা	I
	কে	আ	০		ছ	০			জা	০		গি	০	০		য়া	০		০	০	
I	গা	-মাঃ	-গঃ	|	রা	-া	|	গা	-া	I	ধা	-পা	-া	|	রা	-া	|	গা	-া	I
	পু	০	০		র	০			বে	০		চা	০	০		হি	০		য়া	০	

গানটির শেষ স্তবক-এ আমরা দেখতে পাই– তিন-তিন (৩ । ৩ ।৩ ।৩) মাত্রার ছন্দে নিবদ্ধ-

-া	-া	সা	-া	II	{রা	-া	রা	|	গাঃ	-রঃ	গা	|	মা	পা	পা	|	ক্ষা	ধা	পা	I
০	০	যা	য়্		লা	০	জ		ত্রা	০	স		আ	ল	স		বি	লা	স	
I	মা	গা	মগা	|	রগা	-মপা	মা	|	গা	-া	-া	|	-া	পা	-া	I	[১১]			
	কু	হ	ক০		মো০	০০	হ		যা	০	০		য়্	ও	ই					

এই অংশটুকু সাধারণত মধ্য লয়েই গীত হয়ে থাকে। এই গানের অন্তিম দুটি পদে একই ছন্দে গীত হয়, তবে অপেক্ষাকৃত একটুদ্রুতছন্দে গীত হয়।

আরেকটি গানের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে– প্রকৃতি পর্যায়ের 'মধু -গন্ধে-ভরা মৃদু-স্নিগ্ধছায়া নীপ-কুঞ্জতলে' গানটিতে স্থায়ী ও অন্তরাতে একই ছন্দে বাঁধা। অর্থাৎ তিন-তিন (৩ । ৩) মাত্রার ছন্দে।

বোল-

```
+                   ০                +
ধা  তেৎ  তেটে | নাক  ধি  নানা | ধা
১    ২     ৩     ৪    ৫    ৬      ১
```

```
                                                                ||
দ্‌া  দ্‌া  -ণা II সা  -ঋা  ণ্‌া | -জ্ঞা  ঋা  -সা I সা  -া  -া | সা  সা  -ণ্‌া I
ম    ধু    ০      গ    ন্    ধে    ০     ভ    ০     রা  ০   ০    মৃ   দু   ০

                  I সা  -জ্ঞা  জ্ঞা | -া  জ্ঞা  -রা I জ্ঞম জ্ঞম -জ্ঞরা -জ্ঞ | ঋা  সা  ঋা I
                    স্নি  গ্    ধ     ০   ছা    ০    য়া০  ০০০            নী   প   ০
```

এই গানের শেষ স্তবক– ‘পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয় মদিরা উন্-মুখর তরঙ্গিনী ধায় অধীরা’ এই অংশ থেকে ভিন্ন ছন্দে রচিত। অর্থাৎ চার-চার (৪ । ৪) মাত্রার ছন্দ। এই অংশটুকু দ্রুতলয়ে শ্রীখোলের সঙ্গতে ছন্দের উচ্ছলতায় গানের ভাবকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

```
-া  সা  সা II {ণসা  -া  সা  সা | সা  সা  সা  রা I জ্ঞা  জ্ঞমা  মা  মা | মা  -া  মা  পা I
০   পি  য়ে      উ    চ্   ছ   ল    ত   র   ল   প্র   ল    য়০    ম   দি   রা  ০   উ   ন্

I মা  ণা  ণদা  দা | দপা  -মজ্ঞ  জ্ঞরা  জ্ঞা I জ্ঞা  -মা  জ্ঞা  ঋা | সা  -া  (সা  সঋা)} I সা  -জ্ঞা I ১২
  মু  খ   র০   ত    ও    ০ঙ্   গি০   নী   ধা   য়্   অ   ধী   রা  ০   পি  য়ে০       কা   র্
```

ওমা ণা ণদা দা ।দপা -মজ্ঞ জ্ঞরা জ্ঞা ওজ্ঞা -মা জ্ঞা ঋা। সা -া (সা সঋা)} ওসা -জ্ঞাও[১২]

মু খ র০ ত ও ০ঙ্গি০ নী ধা য়্অ ধী রা ০ পি য়ে০ কা র্

এভাবে রবীন্দ্রনাথ একই গানে ছন্দকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করেছেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যে-বাণী বা পদ থেকে গানটির ছন্দ পরিবর্তন করা হয়েছে একে সঞ্চারী বলা যাবে না। কারণ স্থায়ী-অন্তরার সুর এবং ছন্দান্তর বাণীগুলোর মধ্যে সুরের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। এই পদগুলোকে ঠিক সঞ্চারীর মর্যাদা দেয়া যায় না।

প্রকৃতি পর্যায়ের ঝাঁপতালে নিবদ্ধ (২। ৩। ২। ৩) আট মাত্রার ছন্দে ‘বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে’ গানটিতেও ছন্দান্তর রয়েছে– গানটির দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পদের অন্তিম অক্ষর থেকে ভিন্ন ছন্দে গীত হয়। এই গানটি মারাঠি ভজন ‘নাদবিদ্যা পরব্রহ্ম রস’ এর ভাঙা গান। এই গানটির ছন্দোবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের এক অপরূপ সৃষ্টি। অন্য কোনো বাংলা গানে এরূপ ছন্দোবৈচিত্র্য একেবারেই দেখা যায় না। যা-কিনা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ছন্দ চিন্তার এক মহান দৃষ্টান্ত।

বোল-

\+ ২ ০ ৩ +
ধিন্ না । ধিন্ ধিন্ না । তিন্ না । ধিন্ ধিন্ না । ধিন্
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১

II [স]ন্া -া । ন্া ন্সন্া -ধ্ন্া । [ন]সা -ন্া । ধ্া [ধ]প্া -া I
বি শ্ শ বী০০ ০০ ণা ০ র বে ০

I প্সা -া । সা [স]ন্া সা । রগা -মপা । [প]মা [ম]গা -া I
বি০ শ্ শ জ ন মো০ ০০ হি ছে ০

I -রগা -মা । -পা -া -গমা । রা -া । -সা -া -া I
০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

'নব বসন্তে নব আনন্দে উৎসব নব'– 'নব' 'ব' অক্ষর থেকেই ছন্দ পরিবর্তন হয়েছে– চার-চার (৪ । ৪) মাত্রার ছন্দে–

I প্া প্া । না না -া । না -া । র্সা না র্সা I
ন ব ব স ন্ তে ০ ন ব আ

I [ধ]না -া । পা -া -া । [প]ধা -া । পা মা গা I
ন ন্ দ ০ ০ উ ৎ স ব ন

ছন্দান্তর অংশ:

[৯]
I [র]গা -া -া -া । -া -া -মা গা । রা -গরা গা গা । -া -া মা গা I
ব ০ ০ ০ ০ ০ অ তি ম ০ন্ জু ল ০ ০ অ তি

I র -গরা গা গা । -া -া মা গা । [গ]রা -া গা পা । মা -া গা গরা I [১৩]
ম ০ন্ জু ল ০ ০ শু নি ম ন্ জু ল গু ন্ জ ন০

রবীন্দ্রনাথের একই গানের বিভিন্ন স্তবকের মধ্যে একাধিক তাল, লয় বা ছন্দের ব্যবহার যেমন পাই– তেমনি স্বতন্ত্র তালের বা ছন্দের ব্যবহার আমরা পাই–

'এই-তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ, গানটি কাওয়ালি চার-চার (৪ । ৪) মাত্রার ছন্দের রচনা যেমন পাই, তেমনি তিন-তিন (৩। ৩) মাত্রার ছন্দের ব্যবহারও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ সময়েই সংগীতে ভাবের দোটানাকে ব্যক্ত করার জন্য একই গানে ভিন্ন ছন্দের প্রবর্তন করেন। এই গানটি (৪ । ৪) মাত্রার ছন্দে গানের শুরুতে 'এই তো' বাণী এবং (৩। ৩) মাত্রার ছন্দে 'এই যে' বাণী ব্যবহার করে সুর এবং ভাবের বৈচিত্র্য এনেছেন।

চার-চার (৪। ৪) মাত্রার ছন্দের রচনার স্বরলিপি:

বোল-

+		২			০		৩			+
ধিন্	না ।	ধিন্	ধিন্	না ।	তিন্	না ।	ধিন্	ধিন্	না ।	ধিন্
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১

II সন্া -া | ন্া ন্সন্া -ধ্ন্া | নসা -ন্া | ধ্া ধপ্া -া I
বি শ্ শ বী০০ ০০ ণা ০ র বে ০

I প্সা -া | সা সন্া সা | রগা -মপা | পমা মগা -া I
বি০ শ্ শ জ ন মো০ ০০ হি ছে ০

I -রগা -মা | -পা -া -গমা | রা -া | -সা -া -া I
০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

তিন-তিন (৩ । ৩) মাত্রার ছন্দের স্বরলিপি: (সুরান্তর ও ভিন্নছন্দ)

২ ০ ১ ০
II সা -া রা | গা পা -ধা I পা -ধনা -র্সনা | ধা পা -ক্ষা I
এ ই যে তো মা র্ প্রে ০০ ০ম্ ও গো ০

I গা গা -রসা | সা -সরগা গা I গা -রা -গরা | সা -া -া II I
হৃ দ ০০ য় ০০০ হ র ০ ০০ ণ ০ ০

প্রেম পর্যায়ের একটি গান যেমন, 'আমার নিশীথরাতের বাদলধারা'– গানটি কাহারবা তালে চার-চার (৪। ৪) মাত্রার ছন্দ এবং দাদরা তালে তিন-তিন (৩ ।৩) মাত্রার ছন্দে রচিত। এই গানটির ক্ষেত্রেও তিনি একই রকম ছন্দান্তর ও সুরান্তর করেছেন। যা-কিনা তাঁর গানের ভাব প্রকাশের এক জরুরি মাধ্যম।

চার-চার (৪ ।৪)মাত্রার ছন্দের রূপ:

বোল-

+				০				+
ধা	তেটে	তিন্	তা ।	তা	ধেটে	ধিন্	ধা ।	ধা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১

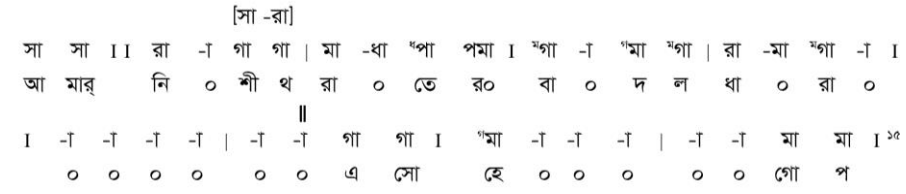

<u>তিন-তিন (৩ ।৩) মাত্রার ছন্দের অংশ</u>: এই অংশটুকু দাদরা তালের স্বাভাবিক লয়ের থেকে একটু দ্রুত ছন্দে গীত হয়ে থাকে।

<u>বোল</u>-

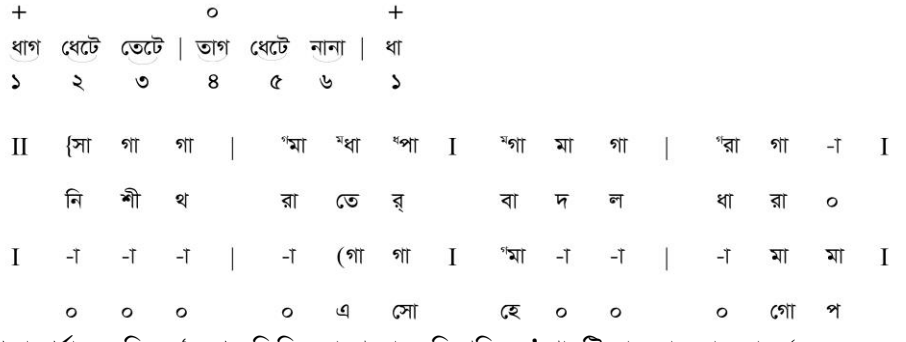

পূজা পর্যায়ে রচিত- 'সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে' গানটি চার-চার-চার-চার (৪। ৪। ৪। ৪) মাত্রার ছন্দে ত্রিতালে এবং তিন-দুই-দুই (৩ ।২ ।২)মাত্রার ছন্দে তেওরা তালে রচিত।

<u>চার-চার-চার-চার (৪ ।৪ ।৪ ।৪) মাত্রার ছন্দের রচনার অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো</u>:

<u>বোল</u>-

ছন্দান্তর অংশটি নিম্নরূপ– তিন-দুই-দুই (৩ ।২ ।২) মাত্রার ছন্দ-

বোল-

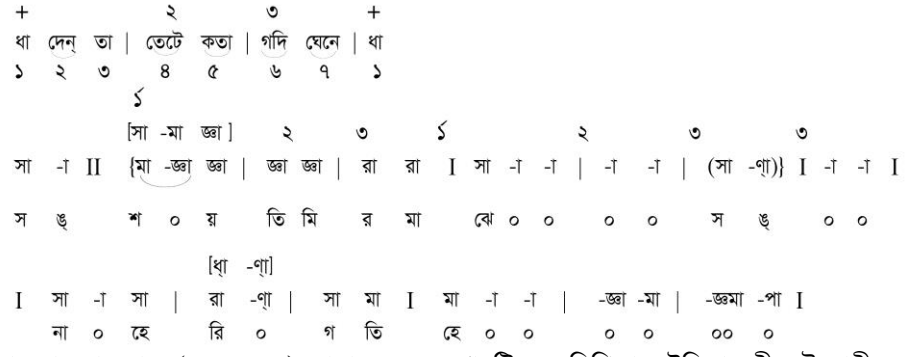

চার-চার-চার-চার (৪ ।৪ ।৪ ।৪) মাত্রার ছন্দের গানটির স্বরলিপিকার ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকৃত এবং তিন-দুই-দুই (৩ । ২ । ২) মাত্রা ছন্দের স্বরলিপি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত।

রবীন্দ্রনাথের একই গানে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের রূপায়ণ, ছন্দোমুক্তির ইঙ্গিত বহন করে। নির্দিষ্ট সময়ের পর পর 'সম' এসে পড়তে হবে এ নিয়মটি তিনি মানতে চাইতেন না। 'নৃত্যের তালে তালে' গানটি যখন স্বরলিপিতে বাঁধা হয়েছে, তখন কিছু 'মাত্রা' স্বরলিপিকার বাড়িয়ে নিয়েছেন 'সম'-ফাঁকের হিসেব মিলাতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা অনুযায়ী 'সম-ফাঁক' অগ্রাহ্য করে গানটি রেকর্ডে গেয়েছেন 'সুচিত্রা মিত্র'।[১৭]

রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, চিত্রকর, গীতিকার ও সুরকার ছিলেন। সাহিত্য এবং সংগীতের সকল জায়গায় তাঁর এই বিচরণ ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। যা কিনা তাঁকে বিশ্বকবি হিসেবে উপাধি দিয়েছে। এতসব সৃষ্টির সাফল্যের মধ্যে তাঁর গানই তাঁকে পূর্ণতা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে ছন্দের গুরু বললেও বোধ করি ভুল হবে না। তাঁর গানে ছন্দবোধ একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। ছন্দ থেকে ছন্দান্তরের এই বিশেষ দিকগুলো রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার মৌলিকত্ব প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ অনুধাবন করে গায়ক-বাদকদের ছন্দবোধ ও ছন্দোবৈচিত্র্যের যথাযথ প্রকাশ বাংলা গানের উন্নতি সাধন করে।

আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গান ও সে গানের ছন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্যে দেখা যায়, বিভিন্ন অঙ্গের গানের মধ্যে ছন্দের পরিপূর্ণ সুষমা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উত্তরভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় তাল-পদ্ধতি সম্পর্কে জানতেন বলেই তাঁর গানে সেই সকল ছন্দসমূহের যথাযথ প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। সংগীত এবং ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অগাধ প্রজ্ঞা তাঁকে নতুন নতুন তাল প্রবর্তনে অবতীর্ণ করেছে এবং তাঁর গানের ছন্দ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নবতর ছন্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছন্দ* (কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ), ১৯৩৬ জুলাই, পৃষ্ঠা. ১৫৩

২. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৯

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান*-একাদশ খণ্ড (কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৩৩৫), পৃষ্ঠা. ২৫

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* পঞ্চবিংশ খণ্ড (কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৩৮০), পৃষ্ঠা. ২২

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান*- ত্রয়শ্চত্বারিংশ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩ ভাদ্র ১৩২১) স্বরলিপিকার–দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা. ৬৫

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছন্দ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৪২

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নবগীতিকা* দ্বিতীয় খণ্ড (কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩২৯ শ্রাবণ), স্বরলিপিকার–দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত, পৃষ্ঠা. ১৫০

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতমালিকা* প্রথম খণ্ড (কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৪৫), পৃষ্ঠা.১২৯

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ষষ্ঠ খণ্ড (কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৩০, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত স্বরলিপি), পৃষ্ঠা.৪৫

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* ষট্চত্বারিংশ খণ্ড,(কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৬), পৃষ্ঠা.৫৭

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* সপ্তবিংশ খণ্ড (কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৯), পৃষ্ঠা.২০

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* চতুঃপঞ্চাশতম খণ্ড (কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আশ্বিন ১৩৭৭), পৃষ্ঠা.৩৩

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান*ষট ত্রিংশ খণ্ড (কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আশ্বিন ১৩৭৭), পৃষ্ঠা.৪৫

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতলিপি* তৃতীয় খণ্ড (কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৬ ভাদ্র, ১৩১৬), পৃষ্ঠা.৫৭

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* একাদশ খণ্ড কেতকী, (কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ, ১৩৩৫), পৃষ্ঠা.২১

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* পঞ্চচত্বারিংশ খণ্ড (কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৮৮৫), পৃষ্ঠা.৬৫

১৭. ফজলে এলাহি চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথের গানে ছন্দের মুক্তি', *বাংলাদেশের হৃদয় হতে*, সন্‌জীদা খাতুন সম্পাদিত, ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃষ্ঠা. ১০৭